

সম্পাদকীয়

সদ্য শেষ হওয়া, লোকসভা নির্বাচন এবার নানা কারণে ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে একটা দিক নির্দেশক হয়ে থাকবে। আর একবার ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তি বা ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত হল। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতন্ত্র সাবালকত্বের পরিচয় দিল। প্রশ্ন ছুড়ে দিল স্বঘোষিত ঈশ্বরের প্রতি— তুমি কি এমনই শক্তিমান? অগনিত ভারতীয়, ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে, ধর্মের বাধা ভেঙে সেই অঘোষিত ঈশ্বরকে টেনে মাটির ধূলায় মানুষে পরিণত করলেন। আবারো প্রমাণ হল একটা রাম মন্দিরের অপেক্ষায় মানুষের রুটি-রুজির আকাঙ্ক্ষা অনেক অনেক বেশি। আমরা আশা করব সদ্য নির্বাচিত সাংসদদের এই কথাটা স্মরণে থাকবে।

বিশ্বব্যাপী প্রবীণদের প্রতি নিগ্রহ ক্রমবর্ধমান হওয়ার দরুন, প্রতি বছর ১৫ জুন বিশ্ব প্রবীণ নিগ্রহ প্রতিকার দিবস হিসাবে পালিত হচ্ছে। আমরা এ বছর ওই দিনটিকে স্মরণ করে আলোচনা সভার আয়োজন করেছি। সেখানে দিনটির তাৎপর্য এবং সংশ্লিষ্ট আইন নিয়ে বক্তব্য রাখবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক। আমরা জানি একদিনের আলোচনা নিগ্রহ প্রতিকারের পক্ষে যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন নিরন্তর সচেতনতা। সর্বোপরি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিগৃহীত প্রবীণরা ঘটে যাওয়া নিগ্রহের কথা সর্বসমক্ষে আলোচনা করতে চান না। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আপন জনের থেকেই নিগ্রহ সহ্য করতে হয়। তবু আমরা এই সেমিনারের মাধ্যমে সচেতনতা তৈরি করতে চাই। আপনারা সবাই অংশ নিন।

একটা সুখবর দিয়ে এই প্রতিবেদন শেষ করতে চাই। ১৫ জুন বিকাল পাঁচটায় আমরা বেথুন আকুপাংচার ক্লিনিক-এর দ্বিতীয় ইউনিটের উদ্বোধন করতে চলেছি আমাদের নিজস্ব ভবনের একতলায়। আপাতত প্রতি মঙ্গল, বৃহস্পতি এবং শনিবার বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা অবধি এটি চালু থাকবে। সবাইকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এবং ক্লিনিক এর সুবিধা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছি।

ঈশ্বরের মুখে হাসি, চোখে জল

গৌতম রায়চৌধুরী

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ। ১৮২৯-র ৪ ডিসেম্বর সতীদাহ প্রথা বন্ধ হল। কিন্তু ভারতীয় নারীদের দুঃখের অবসান হল না। নারীশিক্ষা তখন পাপাচারের নামান্তর। লেখাপড়া শিখলে মেয়েরা বিধবা হবে— এটাই ছিল প্রচলিত মত। বিধবারা সমাজের এক কোণে পড়ে থাকতেন। পারিবারিক-সামাজিক আনন্দানুষ্ঠানে তাঁদের কোনও উপস্থিতি ছিল না। বিড়াল পার করানোর মতো তাদের কাশী-বৃন্দাবনে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। সেখানে বাঙালি বিধবাদের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি। তৎকালীন লোক গণনায় দেখা যায় কলকাতায় বেশ্যাদের মধ্যে এক বড় অংশ অভিজাত বাঙালি বিধবা। বাল্যবিধবা হৈমবতীর কথা শুনুন—

‘যে সব মা-বাবারা নিজের কন্যার জীবনকে এমন উষর মরুতে পরিণত করেন, তাদের খুরে খুরে শতকোটি প্রণাম! ...ভারতেই একমাত্র নারীদের এমন আখমড়াই কলে পেষা হয়, অন্যত্র কোথাও এমনধারা রীতির চল নেই।’ [ডা. হৈমবতী সেন-এর জীবনকথা, প্রবীর গঙ্গোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ, পৃ. তেরো।]

বিধবাদের উপর অত্যাচারের মূল কারণ ছিল আর্থিক— মৃত স্বামীর সম্পত্তির ভাগ না দেওয়া। বাল্যবিধবাদের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহ বিষয়ক গ্রন্থের শেষভাগে আক্ষেপ করেছেন—

‘হে ভারতবর্ষীয় মানবগণ! ...একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ, তোমাদের পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ ব্যভিচার দোষের ও ক্ষণহত্যাপাপের ষোতে উচ্ছলিত হইয়া যাইতেছে। ...যে দেশের পুরুষজাতির দয়া নাই, ধর্ম নাই, ন্যায়-অন্যায় বিচার নাই, হিতাহিতবোধ নাই, সদৃশদ্বিবেচনা নাই, কেবল লোকিকরক্ষাই প্রধান কর্ম ও পরম ধর্ম, আর যেন সে দেশে হতভাগা অবলাজাতি জন্মগ্রহণ না করে। হা অবলাগণ! তোমরা কি পাপে, ভারতবর্ষে আসিয়া জন্মগ্রহণ কর, বলিতে পারি না!’

[বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ। দ্বিতীয় খণ্ড। সাক্ষরতা প্রকাশন। প.ব. নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। পৃ. ১৫৫।]

বিদ্যাসাগরের চেষ্টায় ১৮৫৩-এর ১৬ জুলাই বিধবাবিবাহ আইন প্রণয়ন হলেও হিন্দু সমাজে বিধবাবিবাহ খুব বেশি প্রচলিত হল না। এই প্রেক্ষাপটেই আজকের কাহিনি।

হুগলি জেলার দেবানন্দপুর গ্রাম শরৎচন্দ্রের কল্যাণে সুপরিচিত। এখানকার খ্যাতনামা দত্ত মুন্সী পরিবারে, আমাদের কাহিনির নায়িকা শিবমোহিনীর ১৮৫২ সালে জন্ম। পিতা চণ্ডীচরণের আদরের মেয়ে শিবমোহিনী। কপাল খারাপ। শৈশবে মাতৃহারী। বিমাতার চোখের বালি। বাবাও জজিয়তি সূত্রে বিহারে থাকতেন, তাই নিজেই উদ্যোগী হয়ে দশ বছর বয়সেই বিয়ে দিয়ে দিলেন। কিন্তু দু বছরের মধ্যে বিধবা হয়ে আবার সেই পিতৃগৃহেই ফিরতে হল। বিমাতার গঞ্জনা আরও বেড়ে গেল। যোগ হল শেমিজ ছাড়া এক কাপড়ে থাকা, সিঁড়ির তলায় খালি মেঝেতে শোয়া, একাদশীর নির্জলা উপবাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। চণ্ডীচরণ তখন গ্রামেই, কিন্তু প্রতিবাদ করার সাহস নেই। শিবমোহিনীর সই পাশের বাড়ির হেমাজিনী। তাঁর বাবা সপরিবার ব্রাহ্ম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে কলকাতায় চলে যাওয়া স্থির করলেন। ইতিমধ্যে সুদূর দেবানন্দপুরেও

বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে বিধবাবিবাহের খবর পৌছে গেছে। হেমাদ্বিনীর পরামর্শে শিবমোহিনী কলকাতায় যাওয়া স্থির করলেন। গঙ্গা স্নানের জন্য বাবার অনুমতি নিয়ে, হেমাদ্বিনীদের পরিবারের সঙ্গে কলকাতায় চলে এলেন। বিমাতা রটিয়ে দিলেন শিবমোহিনী কুল ত্যাগ করেছেন।

যথারীতি কয়েকদিন বাদে দুবন্ধু মিলে বিদ্যাসাগরের বাড়ি চলে এলেন। বাজার ফেরত তাদের রকে বসে থাকতে দেখে, ঘরে নিয়ে এসে সব কথা শুনলেন। সেই সময়, টাকার লোভে অনেকেই বিবাহিত স্ত্রীর কথা গোপন করে বিধবাবিবাহ করছিল, কেউ আবার বিয়ের পর, স্ত্রী পরিত্যাগের হুমকি দিয়ে আরও টাকা দাবী করত। বোঝা যাচ্ছে, বাঙালির দুর্নীতি তখন থেকেই শুরু। ফলে বিদ্যাসাগর নতুন বিধবাবিবাহের আগে অনেক খোঁজ-খবর করছিলেন। স্বভাবতই সেটা অনেক সময় সাপেক্ষ। তাই তিনি বললেন— গ্রামে ফেরার আর দরকার নেই। এখানেই থাক। কাজ-কর্ম শেখ। তারপর ব্যবস্থা হবে।

বিদ্যাসাগরের বাড়িতে শিবমোহিনীর নতুন জীবন শুরু হল। শিক্ষা সম্পন্ন হল। অতিথি আপ্যায়ণ ও সহবত শিখলেন। রন্ধনশিল্পে পারদর্শী হয়ে উঠলেন। বিদ্যাসাগরের প্রিয় বেল পোড়া-মোরক্বা বা অন্যান্য মিষ্টি, সব বানাতে পারতেন।

অবশেষে বিদ্যাসাগর কেশবচন্দ্র সেনের ভক্ত, ব্রাহ্ম চণ্ডীচরণ সিংহের সঙ্গে শিবমোহিনীর বিয়ে স্থির করলেন, পাত্র বিদ্যাসাগর নিজে দেখে পছন্দ করেছেন। ব্রাহ্মমতে বিয়ে হয়। বিদ্যাসাগর কন্যা সম্প্রদান না করতে পারলেও, আদরের 'শিবু'র জন্য দানসামগ্রী নিজে পছন্দ করে কিনেছিলেন।

বিয়ের পর শিবমোহিনী চণ্ডীচরণের প্রথম পক্ষের সন্তানদের সযত্নে মানুষ করেন। নিজের কোনও সন্তান না হলেও, সৎ ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে সুখে ছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রণয় তিনি ধাত্রীবিদ্যা শিক্ষা করেন। আত্মীয়-পরিজন ছাড়াও দুঃখী মানুষদের প্রয়োজনে ছুটে যেতেন। এমনকি, অবৈধ সন্তানের জন্মের সময় শিবমোহিনীর উপস্থিতি অনেক শিশুর প্রাণ বাঁচিয়েছিল। এমনই দুটি অবৈধ শিশুর প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন, পরে জীবিকার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন।

আজকের এই অবক্ষয়ের যুগে একটা স্বপ্ন দেখতে বড় ইচ্ছা করে। শিবমোহিনী শান্তিপুরি শাড়ি পড়ে, যার আঁচলে স্বর্ণাক্ষরে লেখা— 'বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে। / সদরে করেছে রিপোর্ট বিধবাদের হবে বিয়ে', সৎ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সেই অবৈধ দুই শিশুর পরিচর্যা করেছেন, অদূরে দাঁড়িয়ে আছেন আমার ঈশ্বর, বিদ্যাসাগর— তাঁর মুখে হাসি, চোখে জল।

তথ্যস্বর্ণ : শিবমোহিনী ও বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ। কল্যাণী দত্ত।

গতদিনের যত কথা। কল্যাণী দত্ত।

১ এপ্রিল থেকে ২০২৪ - ২০২৫ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে।
অনতিবিলম্বে সদস্যপদ নবীকরণ ও প্রবীণবার্তার জন্য ৫০/- টাকা জমা দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

বয়স্কদের সমস্যা ও প্রতিকার

ড. গোবিন্দ মাইতি

Geriatric Society of India-র উদ্যোগে 14th and 15th March একটি সেমিনারে BIGRRC পক্ষ থেকে আমরা কয়েকজন যোগদান করেছিলাম। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল বয়স্কদের সমস্যা ও সমাধান। বেশ কয়েকজন Doctors ও Scientists আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তারই কিছু কিছু অংশ সবার জ্ঞাতার্থে উল্লেখ করছি।

শিশু ও মহিলাদের মতো বৃদ্ধবৃদ্ধাদের জন্য Specialist Doctors রয়েছেন। তাদের আমরা Gerontologist বলি। যদিও এখন সব হাসপাতালে Gerontology চালু হয়নি; তবে ধীরে ধীরে বাড়ছে। Gerontologist রা বৃদ্ধবৃদ্ধাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধানে অনেক বেশি পারদর্শী। তাই বিভিন্ন Specialist-এর কাছে না গিয়ে সরাসরি Gerontologist Doctor-এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। খরচ ও সময় দুই বাঁচবে। সঠিক চিকিৎসাও পাবেন। অবশ্য সব হাসপাতালে এখনও চালু হয়নি। আশা করা যায় ভবিষ্যতে চালু হয়ে যাবে।

বৃদ্ধ বয়সে সাহায্যকারী হিসাবে Trained geriatric helper scheme চালু হয়েছে, সাধারণ নার্স বা আয়ার চেয়ে ওরা অনেক বেশি পারদর্শী যে কোনো Treatment এর সমন্বয় সাধন করতে। প্রয়োজনে এদের সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

আমাদের ভাবতে হবে বয়স একটা সংখ্যামাত্র। বয়সটা ধীরে ধীরে শতকের দিকে এগুবে। বয়স নিয়ে চিন্তা করাটা বৃথা। এখন ৭০-৭৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত অনেকেই সুস্থ জীবন যাপন করে। বর্তমানে তাই ৭৫ বৎসরের উর্দে বৃদ্ধ বয়স ভাবা হয়। মোটামুটি নিজেকে সক্ষম রাখার চেষ্টা করতে হবে। আর নিজের কাজ নিজেকেই করতে হবে। অপরের উপর নির্ভরশীলতা কমানোর চেষ্টা করে যেতে হবে। পারলে digital technology-এর ব্যাপারে একটু জানা প্রয়োজন। কেননা এখন 5G পরিষেবা চালু হয়েছে। যে কোনো ধরনের information তাৎক্ষণিক আদান প্রদান সম্ভব। আজকাল Doctor's chamber, Hospitals, Police station, Help aid adults ও নানা ধরনের instruments সবই internet এর মাধ্যমে উপলব্ধ।

Loneliness একটা বিরাট সমস্যা। তাই social interaction বাড়াতে হবে। সেখানে Vedio call/ Facebook/Apps এর সাহায্য নিতে পারি। তাছাড়া মাঝে মাঝে কাছাকাছি ভ্রমণ খুবই ভালো, সেটা ছোট ছোট group-এ করলে আরও ভালো। নিজেকে সক্রিয় রাখতে হবে। পরনির্ভরতা কমাতে হবে। তাহলে আমাদের দেহ সচল থাকবে। তখন অন্যান্য সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে। মন থেকে দুশ্চিন্তা কমবে। 50 years থেকেই স্বাস্থ্য সচেতন হতে হবে। চিনি বা মিষ্টি খাওয়া চলবে না। সঠিকভাবে জল পান করতে হবে (3-4 litre/day)। আর যেটা প্রয়োজন প্রত্যেকদিন কিছুটা সময় হাঁটাচলা করতে পারলে অনেক রোগব্যধি দূর করা যাবে, বৃদ্ধ বয়সে walking টা সবচেয়ে কার্যকরী ঔষধ।

নিয়ন্ত্রিত খাদ্যাভ্যাস, দৈনিক যোগ ব্যায়াম সঠিক জীবন চর্চার মাধ্যমে অনেক ক্ষেত্রে রোগকে দূরে সরিয়ে রাখা সম্ভব। আমাদের স্বাস্থ্যসচেতন হতে হবে। যতক্ষণ সক্ষম ততক্ষণ বয়সটা কোনো ব্যাপার নয়। সম্ভব হলে যে কোনো কাজের মধ্যে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সেটা পড়াশুনা, বাগান চর্চা, অন্য যে কোনো hobby, সমাজসেবামূলক কাজ হতে পারে। স্বনির্ভর গোষ্ঠিতে যোগদান করতে পারেন।

বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে দুটো দিক থেকে সমস্যা হতে পারে শারীরিক ও মানসিক। মানুষের জীবনে নিত্য অভাব ও অভিযোগ, নানান প্রয়োজনে বিদীর্ণ তাই তার কামনা বাসনা থাকেই। কিন্তু কামনাকে বাড়াতে দিলেই সমূহ বিপদ। কেননা এর কোনো সীমা নেই। ধীরে ধীরে কামনাকে কমিয়ে আনতে হবে। মন জুড়ে শান্তি থাকলে না পাওয়াগুলো বাদ দিয়েই ভালো থাকা যায়, সেটা মনে রাখতে হবে। তাই টাকা পয়সা নয়, আসল হল মানসিক শান্তি। মানসিক শান্তি বজায় থাকলে শারীরিক সমস্যাও থাকবে না।

আমাদের কর্মদক্ষতা ধীরে ধীরে কমে আসে। তাই যে কোনো কাজ ধীরে সুস্থে করতে হবে। তাড়াহুড়া করা চলবে না। সময় একটু বেশি লাগবে। কিন্তু শরীর ও মনের উপর চাপ বাড়বে না। আমাদের এখন ভুলো মন। তাড়াতাড়ি অনেক কিছু ভুলে যাই। সেজন্য Mobile অথবা Diaryর সাহায্য নিতে হবে। বিশেষ করে ঔষধপত্র নিয়মিত ও সময়মতো খাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

উন্নত দেশে বয়স্কদের জন্য বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ও আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা রয়েছে। ভারতে এখনও সেদিকটা অবহেলিত। তাই

নিজেদেরই স্বাস্থ্য সচেতন থাকতে হবে। কয়েকটি সংস্থা Support Elders Pvt Ltd., Care Unlimited Geriatric Soc., Help Age India এখন ভারতে কাজকর্ম শুরু করেছে। ভবিষ্যতে আরও প্রসার ঘটবে।

মৌনী অমাবস্যা

মৃণাল দত্ত

ঘোরতর অন্ধকার আমাদের চারিদিকে
বিশ্বজয়ী ক্রীড়াবিদ্রা লাক্ষিত অপমানিত
আইকন খেলোয়াড়েরা মৌনী নতশির

রাষ্ট্রনায়কেরা গণতন্ত্র আনছে সাধুবাবাদের সঙ্গে
সংসদ ভবনের সাপ্তাহ প্রণিপাতে
আমরা এই সাধনার সঙ্গী
বাকহীন চলচ্চিত্রের মতো।

দেশ যাদের পরিশ্রমী সাফল্যে অহংকৃত
তারাই আজ যৌন লাক্ষিত, পুলিশের হাতে নিগৃহীত
এই দেশ আমাদের না।

একদিন আলো আসবেই অন্ধকারায়
তোমাদের দুঃসাহসী সংগ্রামে
মৌনী নক্ষত্রা হয়তো ঘুম ভেঙ্গে ফুঁসে উঠবে
মানুষের কি কল্যাণে তাদের নিদ্রাভঙ্গ!

কোটি মানুষের জাগ্রত চেতনায় ধিকৃত রাষ্ট্রনায়কেরা
তোমাদের অদম্য সংগ্রাম
একদিন চন্দ্রালোকে বিচ্ছুরিত হবে
আমরা জেগে থেকে তোমাদের দেব
বিজয়মাল্য।

অন্ধ কুসংস্কার

তপন কুমার দাস

ধর্ম ও কুসংস্কারকে কেন্দ্র করে নানারকম ব্যবসা ও লোক ঠিকানো কাজ বহুদিন ধরেই চলে আসছে। তার প্রতিবিধানে যেহেতু ব্যাপক সচেতনতা নেই, সেজন্য সরকারি ভাবে ঠিক আইনি ব্যবস্থাও নেই। দাভালকর মহারাষ্ট্রে এই আইনি বিধান প্রণয়নের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে নিহত হন। বাংলা থেকে সেই ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ দেখা যায় না। একটি খসড়া সরকারের কাছে পেশ করা হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে সঠিক প্রচার করা যায়নি। প্রয়োজন তার পক্ষে জনমত ও সচেতনতা গড়ে তোলা। সচেতনতার আন্দোলন অত্যন্ত প্রয়োজন, কারণ তা হলেই সরকারকে আইন করতে বাধ্য করা যাবে এবং আইন হলেও যথাযথ প্রয়োগে সাহায্য করবে। সচেতনতার জন্য নানাদিক সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

ধর্মীয় রীতিনীতি ও কুসংস্কার একাকার হয়ে গিয়েই সমাজে অন্ধকারের দিক গড়ে তোলে। যার শিকার হয় ব্যক্তি মানুষ। সে ওঝার হাতে ঝাঁটার বারি খাওয়া, গুণিনের হাতে ঝাড়ফুক, জ্যোতিষীর হাতে তাবিজ-কবজ, ফকিরের হাতে টোটকা, আবার বাবাদের হাতে ইজ্জত খোয়ানো, তান্ত্রিকের হাতে সর্বস্ব খোয়ানো প্রভৃতি সবই। এর পাশাপাশি বিজ্ঞানের নামে শিক্ষিতদের জন্য দেখা দিয়েছে নানারকম বিভ্রান্তিকর উপাদান। আমেরিকায় একটি বৃহৎ সংস্থা গড়ে উঠেছে বিজ্ঞানের নামে কুহেলিকা দূর করার জন্য। ভারতে ব্যাঙ্গালোরে বিজ্ঞান ফোরাম নামে একটি সেইরকম সংস্থা গড়ে উঠেছে। অনুরূপ সংস্থা বাংলায় এখনও গড়ে ওঠেনি, তার প্রধান কারণ শিক্ষিত ও বিজ্ঞান জগতের মানুষদের এ ব্যাপারে অনীহা। সচেতনতার আন্দোলনও বাংলায় কম, যা পারে কুসংস্কারকেন্দ্রিক অপরাধ ও প্রতারণা কমিয়ে আনতে।

মনে করা যাক, এক সময় উড়ন্ত চাকি বা ইউ এফ ও নিয়ে অনেক হৈচৈ হতো। আকাশে দেখা দেওয়া চক্রাকার উজ্জ্বল চাকতি নাকি গ্রহান্তরের প্রাণীর সঙ্কেত। অবশ্য এখন তা বলা বন্ধ হয়েছে। এখনও প্রচলিত আছে বারমুড়া ট্রান্সেলে বিমান হারিয়ে যাবার কাহিনি। বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বলা হয়, মানুষ তিন মাত্রা বোঝে— দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ। গুরু দুই মাত্রা বলে সামনে পিছনে চলে। বারমুড়া ট্রান্সেলে চার মাত্রা থাকায় সেখান দিয়ে বিমান হারিয়ে যায়। এই কথার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানকে অলৌকিকতার মাত্রায় নিয়ে আসা হয়। চন্দ্রগ্রহণ নিয়ে এত জানার পরও কুসংস্কারের শেষ নেই। চন্দ্র-রহস্য তেমনি এক কুসংস্কার। বলা হয়ে থাকে, চাঁদের শক্তিতে প্রতি পূর্ণিমায় শিশুর জন্মহার বেড়ে যায়। ১৯৭৪ থেকে ১৯৭৮ পর্যন্ত এ ব্যাপারে একটি সমীক্ষা নেওয়া হয়। তেমন কোনও তথ্য এর পিছনে পাওয়া যায় না। জানার পরও এমন বিশ্বাস থাকাই হল কুসংস্কার। যেমন চন্দ্রগ্রহণের কারণ জানার পরও তা নিয়ে কুসংস্কার। আর একটি কুসংস্কার হল পামিস্টি— হাত দেখো, ঠিকুজি বিচার। একবার এক জ্যোতিষীকে একটি হনুমানের হাতের ছাপ দেখানো হলে তিনি অক্লেশে তার চাকরির সুদিন, আত্মীয় বিয়োগ সন্নিহিত প্রভৃতি কথা বলে গেলেন। এক জনপ্রিয় পামিস্ট কী নিজের হাত দেখে জানতে পারেননি যে তাকে কিছু পরেই পুলিশ গ্রেপ্তার করতে চলেছে। একজন হাত দেখে ভাগ্য বলা ব্যক্তি একটি বাসস্টপের নীচে বসে সকলের ভবিষ্যৎ বলে দিচ্ছিলেন, কিন্তু

তিনি নিজের ভবিষ্যৎ জানতেন না যে কিছুক্ষণ পরে সেই স্টপের সিমেন্টের ছাউনি তার মাথায় ভেঙ্গে পড়বে। কার্লিয়ান এফেক্ট নিয়ে বলা হয়ে থাকে বিশেষ ভোল্টেজের মাত্রায় ফটোগ্রাফিক প্লেটে ছবি তুললে জীবন্ত হাত বা গাছের পাতার চারিদিকে “অরা” বা জ্যোতি দেখা যায়। প্রাণের সাথে সম্পর্ক থাকলে তার ছবিতে মানসিক অবস্থা প্রতিফলিত হয়, যেমন যীশু বা রামকৃষ্ণের ছবিতে দেখা যায়। এইসব ঘটনার একটাই তাৎপর্য, তা হল যে সব ধর্মীয় মিথ্যা বা কুসংস্কার যুক্তি দিয়ে মানুষ মানতে পারে না, তাকে বিজ্ঞানের সাহায্যে মানাবার চেষ্টা।

এখন বিকল্প চিকিৎসার নামে প্রায় গুণিনমার্কী ওষুধ বাজারে পাওয়া যায়। পতঞ্জলির ওষুধ তার অন্যতম। বিজ্ঞানের নাম করে চোখ ধাঁধানো বিজ্ঞাপনে উপস্থাপনা করা হয়। এগুলি কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে বাজারে আনা হয় না। বিজ্ঞানসম্মত বলে প্রচার করা হয়। আয়ুর্বেদের অভিজ্ঞতানির্ভর ওষুধকেও বিজ্ঞান বলা হয়ে থাকে। এইভাবে বিজ্ঞানের মূল ধারণাকেও বদলে দেওয়া হয়। গাছ গাছড়ার মধ্যে কী জারক থাকে তার সাথে রোগের প্রতিক্রিয়া কী সে পরীক্ষা ছাড়াই এইসব ওষুধ বাজারে আসে। পক্ষান্তরে একই গাছ গাছড়া থেকে পরীক্ষা প্রয়োগের পথে এ্যালোপ্যাথি ওষুধ তৈরি হয়। কুইনাইন আবিষ্কার হবার পর নিশ্চয়ই কেউ শিংকনার গাছের ছাল বেটে খাবে না। কাজেই রামবাবার হিমালয় ভ্রমণ করে “সর্বরোগ হর” হাজির করা কখনই বিজ্ঞানসম্মত ওষুধ হয়ে যাবে না। সাধুবাবার নিজের লেখা উপাদান পরীক্ষা করে দেখা গেছে তার সবকিছু প্রোডাক্ট নির্ধারিত মানের নীচে। আর কবিরাজি ওষুধ সম্পর্কে একটা ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে, এই ওষুধে উপকার না হলেও অপকার হবে না। মল পরিষ্কার করার ওষুধ যদি মল বদ্ধ হবার ওষুধে থেকে যায় তবে তা অপকার হবেই। আমেরিকাতে একটি আয়ুর্বেদ ওষুধ পরীক্ষা করে দেখা গেছে তা প্রসূতির ক্ষতি করতে পারে। সে কথা না লেখা থাকায় সেটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আবার হোমিওপ্যাথি সম্পর্কেও কিছু অপপ্রচার আছে। যে চিকিৎসা হোক না কেন— তা হতে হবে বিজ্ঞানসম্মত।

জ্যোতিষী চর্চা ভারতে বর্তমানে চিন্তার দৈন্য প্রকাশ করছে। অনেক রাজ্যে তাকে পাঠ্য বই করা হয়েছে বিজ্ঞানসম্মত বলে তুলে ধরতে। মজার ব্যাপার হল, যত জ্যোতিষী কাগজে বিজ্ঞাপন দেয় তারা কিন্তু তাত্ত্বিক, কামাক্ষাফেরত সুনামানি তন্ত্রে দক্ষ, সূর্যশাস্ত্রী, অস্ত্রযোগী প্রভৃতি বলে থাকে, বিজ্ঞানসাধক বলে প্রচার করতে লজ্জাই পাবেন। অনেকে কম্পিউটারে কুণ্ডলী বলে আধুনিক হবার চেষ্টা করেন। কিন্তু কুণ্ডলীর সফ্টওয়্যারে কোন গ্রহে কোন ক্ষতি বা উপকার লেখা থাকবে, সে তো তাই লিখবে। তার আর আলাদা মূল্য কী আছে। জ্যোতিষ এখন কুসংস্কারনির্ভর সবথেকে বৃহৎ প্রতারণার ব্যবসা। প্রথমত মিথ্যা বিচার, দ্বিতীয়ত যে রত্ন নির্দেশ দেওয়া হয় প্রায় সবক্ষেত্রে বুটা রত্ন ব্যবহার হয়ে থাকে। খ্যাতমান গণিতজ্ঞ হিলবার্ট একবার বলেছিলেন, পৃথিবীর ১০ জন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিকে যদি পৃথক পৃথক ভাবে জিজ্ঞাসা করা হয় কোনটি সবথেকে নির্বোধ শাস্ত্র? তারা সকলেই একই নাম বলবেন, জ্যোতিষ।

সামাজিকভাবে কুসংস্কার ও ধর্মীয় ধাক্কা যা ধর্মীয় কুসংস্কারের উপরই মূলত নির্ভর করে তা স্বরূপ জানা না গেলে মানুষ প্রভাবিত হতেই থাকবে। মুক্ত মন মুক্ত চোখে আধুনিকতম ধোকাবাজির সম্মুখীন হতে হবে।

কুসংস্কার বলতে আমরা কী বুঝি, সে বিষয়ে আমেরিকার মুক্ত চিন্তার অগ্রদূত রবার্ট ইনগারসোল একটা সূত্র দিয়েছিলেন, সেই চিন্তাই কুসংস্কারের উৎস, যথা ১। যুক্তি প্রমাণ পরোয়া না করে বিশ্বাস করা

হয়। ২। অন্যের কাছে রহস্যময় কথা বা বিশেষ আচরণের কথা শুনে আবার অন্যকে তা বলা হয়। ৩। বিশ্ব ভাগ্যচক্রে চলে বলে বিশ্বাস করা। ৪। মনই বস্তু জগৎকে চালনা করে বলে মনে করা। ৫। শক্তি বা ক্ষমতা বস্তু জগৎকে পরোয়া করে না, বা বস্তু জগৎ ব্যক্তিকে পরোয়া করে না বলে ভাবা। ৬। অলৌকিক চমক বা মোহিনী শক্তিকে মনে স্থান দেওয়া এবং ৭। যখন অজ্ঞতা আশ্রিত চিন্তাই প্রধান হয়ে ওঠে।

কুসংস্কার একজন মানুষের অজ্ঞতার সঙ্গে সমানুপাতিক। মানুষ যত দুর্বল হবে, মনোবল হারাবে, তত কুসংস্কারের উপর নির্ভর করবে। জীবনে বহু রকমের অনিশ্চয়তা আছে, তাকে দূর করার সহজ উপায় হিসাবে অনেক রকম কুসংস্কার মানুষ অনুসরণ করে। বৃহত্তরভাবে মনে করলে গোঁড়া ধর্ম, অবিজ্ঞান, প্যারানর্মাল প্রভৃতি হল কুসংস্কারের ভিত্তি।

ভারতে প্রায় প্রতিটি বাবার আশ্রম, গ্রাম্য ও শহুরে গুরু, ধর্মস্থানে মৌলবি, যাজক, পুরোহিত, তান্ত্রিক কুসংস্কারের শিক্ষাদাতা। কোটি কোটি টাকার ব্যবসা হয় আশ্রম ঘিরে। ছোট ছোট গুরু তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের জন্য বহু রকম কুসংস্কারের আশ্রয় নেয়। প্রতিটি মানুষের জানা দরকার যে এরা এবং পামিস্ট, জ্যোতিষী, ফকির, কালো ম্যাজিসিয়ান সবাই কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনকে প্রতারণা করার ক্ষেত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

কুসংস্কার এখন আর হাঁচি কাশির মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। তা জটিল আকার ধারণ করেছে। মুক্ত মন, মুক্ত চিন্তাকে আশ্রয় করেই মুক্ত সমাজ গড়তে হবে— বিজ্ঞানই আমাদের আশ্রয় শিবির।

৭.৪.৫ জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় সদা জাগ্রত
পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)
২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭
দূরাভাষ : ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪
যাদবপুর কেন্দ্র



বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ : অন্তর্পূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে
দূরাভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সকাল ৮-১১টা/সন্ধ্যা ৬-৮টা)

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক মণ্ডলী : কবে, কখন

পরামর্শ ১০০টাকা + পি.আর.সি. সহায়তা
১০টাকা (প্রতিবার)

- ১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী - এম.এস. (অর্থোপেডিক)
২য় ও ৪র্থ সোমবার সন্ধ্যা ৬টা
- ২) ডঃ মৌমিতা চাটার্জী - এম. ডি. (জেনারেল
অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন) - মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬টা
- ৩) ডঃ কে. মজুমদার - এম.ডি (জেনারেল
মেডিসিন) বিকেল ৫টা
- ৪) ডঃ সুদীপ্ত গুপ্ত - ডি.জি.ও
(গাইনোকলজিস্ট) সন্ধ্যা ৭টা
- ৫) ডঃ সৌম্য চাটার্জী - এম.ডি. (নিউরো-সাইকিয়া-
ট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) শুক্রবার সন্ধ্যা ৮টা
- ৬) শ্রীমতী হৃদলীনা মহাপাত্র (মেন্টাল
কাউন্সিলিং) শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা
- ৭) শ্রীমতী অঞ্জলী দাস (ফিজিওথেরাপিস্ট)
সোম, বৃহঃ, শনি, সন্ধ্যা ৬.৩০

নির্দিষ্ট সময়ের ৩০ মিনিট আগে নাম লেখাতে হবে

কম খরচে সমস্ত রকম প্যাথোলজি

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮-১১টা, বিকাল ৭-৮টা)
যোগাযোগ : ২৪২৫-৪৪৫৪